লিঙ্গচৈতন্য আর যৌনতা বিষয়ে নৈতিকতার শাসন সাংঘর্ষিক

মানস চৌধুরী

এক.

বাংলাদেশে লিঙ্গ-সচেতনতার প্রবাহ নিয়ে ভাবতে বসলে মুখ্যত নাগরিক শিক্ষিত তৎপরতার দিকেই তাকাতে হবে। সেখানে একটা ধারাবাহিক অটুট ঊর্ধ্বমুখী প্রগতির চিত্র হাজির করার চেষ্টাও কার্যকর কিছু হবে না। আর সেটা আমার লক্ষ্যও নয়। বরং, আমি বলতে চাইছি, ঢাকা ও অন্যান্য নগরে শিক্ষিত শ্রেণির মধ্যে লিঙ্গচৈতন্য এবং সে সংক্রান্ত তৎপরতার কোনো চিত্র আঁকলেও সেখানে একটা ধারাবাহিকতার চিত্র আঁকা সম্ভব নয়। একদিকে বামপন্থী রাজনৈতিক সংগঠনসমূহ এবং সাংস্কৃতিক তৎপরতায় নারীদের অংশগ্রহণ ও লিঙ্গসম্পর্কের বিতর্কগুলোকে দেখতে হবে। আবার বাঙালি মধ্যবিত্তের রাজনৈতিক চৈতন্য গড়ে ওঠার কালে মধ্যবিত্ত নারীদের পাবলিক পরিসরে আত্মপ্রকাশকে দেখতে হবে। আবার রাষ্ট্রধর্ম বিলের বিরোধিতা যখন অত্যন্ত মৃদু, তখন অকুতোভয় নারী সংগঠনগুলোর আত্মপ্রকাশ ও চ্যালেঞ্জকে দেখতে হবে। খোদ তসলিমা নাসরিনকে নিয়ে সেক্যুলার ও ইসলামপন্থীদের ভিন্ন ভিন্ন অস্বস্তিকে পাঠ করতে হবে। অন্যদিকে, ধর্ষণবিরোধী জাহাঙ্গীরনগরের আন্দোলনের ফলবর্তী হিসেবে একটা প্রাতিষ্ঠানিক-আইনি কাঠামোগত সংস্কারগুলো যে পরের দশকে হতে থাকল, সেগুলোর দিকে দৃকপাত করার প্রয়োজন পড়বে। উন্নয়ন সংস্থা ও গড়পরতা মধ্যবিত্ত কর্মক্ষেত্রে লিঙ্গ-সচেতনতার, উপরতল্লাশিমূলক হলেও, যে পলিসি-বদল ঘটল সেটার দিকে মনোযোগ আনতে হবে। আবার সাইবারস্পেসে একটা পুরুষালি বিদ্বেষমূলক অভিব্যক্তি কাঠামোর মধ্যে নারীপক্ষীয় যেসব আলাপ-আলোচনা গড়ে উঠছে, সেগুলোর গুরুত্বও স্বতন্ত্রভাবে আমলে আনতে হবে। আমার বলবার জায়গা হলো, এসব ভিন্ন ভিন্ন স্রোতের প্রবাহকে অবধারিত কোনো একরৈখিক কিংবা পরস্পরসাপেক্ষ হিসেবে দেখতে আমি পাই না। দেখা জরুরি কি না তা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র প্রসঙ্গ। আবার সকল বৌদ্ধিক রাজনৈতিক তৎপরতাই যে কোনো-না-কোনোভাবে, কোনো-না-কোনো মাত্রায় সংশ্লিষ্ট, সেই আপ্তজ্ঞানের বিরোধীও আমি নই। কিন্তু নারীস্বার্থ-বিষয়ক এবং/কিংবা নারীবাদী নানাবিধ তৎপরতার মধ্যে কাল ও অ্যাজেন্ডার যথেষ্ট সামঞ্জস্য না থাকার বৈশিষ্ট্যটাকে আমি আমলে আনি।

দুই.

তবে এখন আমার প্রতিপাদ্যের সঙ্গে এই উপলব্ধির প্রত্যক্ষ কোনো সম্বন্ধ নেই। বরং, একটা নির্দিষ্ট কালে লৈঙ্গিক চৈতন্যের নাগরিক প্রবাহের সঙ্গে আমার সংযোগ-সংশ্লেষকে পর্যালোচনা করবার একটা তাগিদ কাজ করেছে বলেই আগের অংশের অবতারণা। যেহেতু কালসমূহ ও চৈতন্যরাজি এবং তৎপরতাগুলো বিবিধ ও নিরন্তর ধারাবাহিক না বলে আমি বিবেচনা করি তাই উল্লেখ। আর পাঁচজনের মতো আমারও লিঙ্গচৈতন্যের প্রাথমিক বনিয়াদ সাধারণ সাহিত্যপাঠের ফলাফল হিসেবে গড়ে ওঠে। নজরুল-সুকান্তের কবিতা যেভাবে গড়ে দেয় সেভাবেই। কিন্তু আমার ক্ষেত্রে আরো রেখাপাত করেছিল

ভিন্ন একটা রচনাও। ততদিনে বিদ্যাসাগরের কিছু প্রবন্ধ চোখে পড়েছে, আর শরৎচন্দ্রকে গড়ে আমার নারীর সঙ্গে সম্পর্কসৃষ্টিতে সংবেদনশীল মনে হতো। এরকম সময়েই আপাত গৌণ ও লঘু অন্নদাশঙ্কর রায়ের বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে তাঁর শিক্ষকের সঙ্গে নারীর অবস্থান বিষয়ে একটা তর্ক স্কুল জীবনের শেষে চোখে পড়েছিল। সেখানে একটা তর্কে তিনি শিক্ষকের ধূর্ততার সঙ্গে জিততে পারেন নি বলে উত্তরকালে আক্ষেপ করেছিলেন। এই তর্কটার মুখ্য প্রতিপাদ্য ছিল সমাজে নারীর অবস্থান বিষয়ে। শিক্ষক দাবি করছিলেন নারী অধস্তনই; ধর্মগ্রন্থ ও অন্যান্য বৈজ্ঞানিক প্রমাণাদি হাজির করতে তিনি ব্যস্ত ছিলেন। এর পালটা যুক্তি ক্লাসে অন্নদা দিচ্ছিলেন। কিন্তু পরিশেষে শিক্ষক তাঁকে অপ্রস্তুত করে দেন যৌনসঙ্গমের আসনবিন্যাস তুলে। এতকাল পরে অন্নদাশঙ্করের রচনাটির নাম না মনে পড়লেও বিবিধ যৌনচর্চা বিষয়ে তাঁর সেইদিনের অজ্ঞতা এবং শিক্ষকের চাতুরির বিপরীতে টিকতে না-পারা নিয়ে তাঁর নিদারুণ ক্ষোভ আমার এখনো মনে আছে। তাঁর সংক্ষোভটি আমাকে রেখাপাত করেছিল।[১] এর দু'চার বছরের মধ্যেই তসলিমা নাসরিন তাঁর কবিতা দিয়ে বাংলাদেশের আনাচে-কানাচে ভিন্নস্বর প্রতিষ্ঠা করেছেন। আমি গ্রাহক হিসেবে সেগুলো পড়ি। ফলে লিঙ্গ প্রশ্নটি ঘটনাচক্রে খুব গোড়া থেকেই আমার জন্য অত্যাবশ্যকভাবে যৌনতার সামাজিক প্রশ্নও বটে।

১৯৯৮ সালের ধর্ষণবিরোধী ছাত্রী/শিক্ষার্থী আন্দোলনটি [২] জাহাঙ্গীরনগরে বিকশিত হলেও এর প্রভাব ও অনুবর্তী ঘটনাপ্রবাহ সুদূরপ্রসারী ও বিস্তৃত ছিল। কয়েকটা উল্লেখযোগ্য ফলাফল দেখতে চাইলে এভাবে ভাবা চলে :

- পত্রপত্রিকায় সাধারণভাবে লিঙ্গ প্রশ্ন এবং বিশেষভাবে যৌন (নির্যাতন) প্রসঙ্গ আরো কম অস্বস্তি সমেত প্রকাশিত হতে শুরু করল;
- লিঙ্গ প্রসঙ্গ কেবল 'বউ পেটানি' আর 'দরিদ্র/গ্রামীণ' অঞ্চলের ঘেরাটোপে রাখার সংবাদানুশীলন প্রসঙ্গ বদলালো;

---

[১] এই রচনাকালেও অন্নদাশঙ্কর রায়ের সেই প্রবন্ধখানা আমি খুঁজে তার নাম দেবার তাগিদ বোধ করেছি। করে উঠতে পারলাম না বলে পাঠক-দরবারে ক্ষমা চেয়ে রাখি। তবে সাধারণভাবে কখনো পাঠ করেন নি এমন পাঠক অন্নদাশঙ্কর রায়ের প্রবন্ধের বহুবর্ণিলতা উপভোগ করবেন বটে। তাঁর লিঙ্গ বিষয়ে উপলব্ধি লক্ষ করবার মতো, যদিও তা অবশ্যই আধুনিক কালের নারীবাদী মানদণ্ডে উত্তীর্ণ না হবার সম্ভাবনা রাখে।

[২] আন্দোলনটি নিয়ে অদ্যাবধি নানারকম উদ্ধৃতি আসে। একটা সংকলন আন্দোলনের পর সংগঠকদের একাংশ প্রকাশ করেছিলেন, এখন যা আন্তর্জালে পাওয়া যায় :

http://www.grontho.com/ধর্ষণবিরোধী-ছাত্রী-আন্দো/

- সাধারণভাবে দপ্তর-সংস্কৃতিতে, বিশেষভাবে এনজিওসমূহে লিঙ্গ একটি আবশ্যক জ্ঞানপ্রবাহ হিসেবে চিহ্নিত হলো। যদি জ্ঞানের ভেজাল থাকেও তাতেও মাত্রা বা প্যারামিটার আকারে নানাবিধ ম্যানুয়েল/বিধিমালা প্রণীত হলো;

- বিভিন্ন ক্যাম্পাসে ও অফিসে যৌনাত্মক নির্যাতন, নিপীড়ন ও হেনস্তা বিষয়ে আপত্তি প্রকাশ্য হতে শুরু করল; কার্যত নানাবিধ যৌন নিপীড়নবিরোধী আন্দোলন দৃশ্যমান হলো;

- লাগাতার আন্দোলন, বিশ্লেষণ ও নারী অধিকারকর্মীদের চাপে রাষ্ট্র প্রতিক্রিয়া করবার তাগিদ বোধ করল; সরকার যদি তুলনামূলকভাবে বিমূঢ় থাকেও, আদালত বিধিপ্রদান করলেন;

- চারদিকে নানান পেশার মানুষজন লিঙ্গচৈতন্যের ঘোষণা দিতে থাকলেন; বস্তুত এমনকি কখনো কখনো সাংসদ-মন্ত্রীদেরও প্রায় নারীবাদী মনে হবার সুযোগ পাওয়া যায়;

- পুরুষদের মধ্য থেকে নারীবাদী হবার আগ্রহ, বা অন্তত নারীবাদীদের কাছে গ্রহণযোগ্য পুরুষ হবার প্রচেষ্টারও নাগরিক প্রবণতাগুলো তৈরি হতে থাকল।

আমি এই তালিকাতেই আন্দোলনটির প্রভাবকে সীমিত রাখতে চাই না। বরং, এগুলো এখন মনে পড়ল এবং একটা অসম্পূর্ণ তালিকার সূচনা হিসেবেই নথি করে রাখলাম। কিংবা এর সবগুলোর নিরঙ্কুশ কারক হিসেবেও একটা আন্দোলনকেই দেখছি না। একটা সামাজিক ঘটনা নানান কিছুর উপলক্ষও হতে পারে। অর্থাৎ কারক না হলেও উপলক্ষ হিসেবে দেখার পরিকাঠামো করে নিয়েছি ওই আন্দোলনটিকে।

আমার একান্ত ব্যক্তিগত[৩] বিকাশের ক্ষেত্রে, অন্যান্য কিছুর পাশাপাশি, বিস্তর সংগঠন ও সাংগঠনিক তৎপরতার সঙ্গে সম্পৃক্ত হবার একটা পরিস্থিতি হয়েছিল। জাহাঙ্গীরনগরের লিঙ্গভিত্তিক এই আন্দোলনের একজন সমর্থক ও কর্মী[৪] হিসেবে নানান সংগঠন থেকে নানান প্রয়োজনে ও আগ্রহে কয়েকজন যোগাযোগ করেছিলেন। তাদের মধ্যে ছিলেন পার্বত্য অঞ্চলের স্বাধিকার আন্দোলন থেকে সমতলের অন্য জাতির কৃষিজ ভূমি রক্ষার আন্দোলনের কর্মী; নারায়ণগঞ্জের উৎখাতকৃত যৌনকর্মী[৫] থেকে শুরু

---

৩ বলাবলি ও লেখালেখিতে 'ব্যক্তিগত' শব্দটিকে ব্যবহার না করে পারি না। কিন্তু আমি সত্যিই 'ব্যক্তিগত'র এমন কিছু পরিমণ্ডল আলাপ-তর্ক-বিশ্লেষণে অবশিষ্ট দেখি না। এটা খুব মুশকিলের একটা অনুভূতি।

৪ সমর্থক বা কর্মীর দাবিটা আরামদায়ক নয়, যেটা কিনা গুণগত ও রাজনীতি-দর্শনগত দিক থেকেই শিক্ষার্থীদের, এমনকি ছাত্রীদের আন্দোলন। কিন্তু ইতিহাস বা দলিলের দৃষ্টিকোণ থেকেও আমাদের একাধিক সহকর্মীর জন্য এর একটা অংশীদার থাকা অবধারিত হয়ে পড়েছিল। যদি আর কোনো প্রসঙ্গ বাদও থাকে, খোদ তদানীন্তন বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন এসব শিক্ষককে 'মদদদাতা' হিসেবে প্রাতিষ্ঠানিকভাবেই শনাক্ত করেছিল, বিবৃতি দিয়েছিল।

৫ উন্নয়ন সংস্থার কার্যক্রম ও সে সুবাদে পত্রপত্রিকার প্রচারণায় 'যৌনকর্মী' একটি মূল্যবোধ-নিরপেক্ষ পেশাবর্গ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। ৯০ দশকের শেষভাগে প্রাসঙ্গিক আলাপ আলোচনায় রেহনুমা আহমেদ, আমি ও আমাদের বান্ধব/মিত্রগণ 'বেশ্যা' কিংবা 'বেশ্যাবৃত্তি' প্রয়োগ করেছি। এখনো তাগিদ বোধ করি। আশা করি এটা স্পষ্ট হয় যে, আমরা বরং শব্দটির ভিতরে অনুপ্রবিষ্ট সামাজিক ঘৃণা ও মূল্যবোধের বেহুদা শাসনকে প্রত্যাখ্যান করার লক্ষ্যেই তা প্রয়োগ করি বা করেছিলাম।

করে লিঙ্গীয় পরিচয়ে অন্যান্য লিঙ্গের মানুষজন; টঙ্গীর শ্রমিক সংগঠক থেকে শুরু করে মধ্যবিত্ত পরিসরের চাপে থাকা 'বাউল'; রাষ্ট্রীয় বাহিনীর তোপে থাকা রাজনৈতিক সংগঠনের কর্মী থেকে সাহিত্যচক্র পরিচালনাকারীবৃন্দ। নানান অনুঘটক সেসব পরিচয়ের উপলক্ষ হয়ত ছিল, কিন্তু সেগুলো স্বতন্ত্র সব সম্পর্কই বটে। সেই বিস্তর সম্পর্কের চাপ দীর্ঘকাল আমার পক্ষে বহন করাও সম্ভব হয় নাই। বরং, উত্তরকালে সেসব পর্যালোচনা করতে গিয়ে নানাবিধ এই যোগাযোগের পরিমাণ আমাকে বিস্মিত যেমন করে, তেমনি বাংলাদেশে চলমান নানান প্রান্তিক মানুষের নানান সংগ্রাম নিয়ে আমার উপলব্ধি গড়ে ওঠাতে এই পর্বকালটার স্বতন্ত্র গুরুত্বও আমি শনাক্ত করতে পারি। এ সকল লড়াইবর্গ কিংবা তাতে অংশগ্রহণকারীগণ লিঙ্গ প্রশ্নটিকে সমার্থক করে দেখতেন (বা দেখে থাকেন) তা নয়, কিংবা যৌনতার জিজ্ঞাসাকেও। তবে লিঙ্গের উপলব্ধি আর যৌনতার জিজ্ঞাসা যে সম্পর্কিত, সেই উপলব্ধিতে কোনো কোনো বর্গ সততই স্পষ্ট। এটা বলা বাহুল্য হবে যে এই দুই জিজ্ঞাসার পৃথকীকরণ গড়ে একটা মধ্যবিত্ত প্রপঞ্চ।

তিন.

লিঙ্গসম্পর্ক প্রসঙ্গে যৌনতার জিজ্ঞাসাটির একটা ইতিহাস খোদ তসলিমা নাসরিনের বিদায় পরিস্থিতির সঙ্গে সম্পর্কিত করে দেখি আমি। তসলিমা নাসরিনের দেশত্যাগের কারণ অবশ্যই ইসলামপন্থী রাজনৈতিক তৎপরতা। ইতিহাসে সে বিষয় খোদাই করা আছে, তা নিয়ে নতুন তর্ক করা অসম্ভবপ্রায়। কিন্তু তসলিমা দেশে থাকাকালীনই প্রতিপক্ষ হতে শুরু করেছিলেন, হয়ে পড়েছিলেন, মধ্যবিত্ত চিন্তক-তৎপর মানুষদের থেকে। কেবল পুরুষকুলই নয়, তসলিমাকে প্রতিপক্ষ ভাবছিলেন খোদ মধ্যবিত্ত নারী অংশেরও অনেক প্রতিনিধি, এমনকি কখনো কখনো নারী আন্দোলনকারীগণের একাংশও। এই প্রস্তাবনাটি ভীষণ অজনপ্রিয় হবার আশঙ্কা সত্ত্বেও আমি একাধিকবার সামনে এনেছিলাম।[৬] তসলিমা যৌনতার অভিব্যক্তিকে লুকানোর বিধিকে লঙ্ঘন করেছিলেন। তিনি মধ্যবিত্ত রুচির, বাম-ডান নির্বিশেষে, একগামিতার জয়গানকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। এবং অতি অবশ্যই যৌনতার অনুশীলনকে

---

৬ অনেক বছর আগে, ২০০৬ সালে, প্রসঙ্গটি এই পত্রিকাতেই উত্থাপন করেছিলাম এবং আমার যুক্তি পেশ করেছিলাম। কিছু পাঠক পড়ে থাকবেন আন্দাজ করা যায়। পত্রিকাটির পাঠকজগৎ খুব বিশিষ্টও বটে। আমার এরকম গুরুতর অবস্থানের পর আমি কিছু সামান্য শোরগোল আশা করেছিলাম। আমাকে জবাবদিহিতার জায়গায় দাঁড় করানো, কিংবা আমার প্রতি কিছু জবাবদিহিতা। তবে সেরকম কিছু ঘটে নি। একটা চলমান নারীবাদী প্রজ্ঞা ও তৎপরতার মধ্যে একে আমি ধরে নিয়েছি আমার যুক্তি অভ্রান্ত ছিল। এ ছাড়াও কাছাকাছি সময়ে জাপানের কিয়োটো জার্নাল বলে একটা শিল্প-সাহিত্য পত্রিকায় এই বিষয় নিয়েই ছোটো একটি নিবন্ধ লিখেছিলাম এবং ঢাকার দ্য ডেইলি স্টারের একটা নারী দিবস ক্রোড়পত্রের নিমন্ত্রণী রচনাতেও প্রসঙ্গটা উল্লেখ করেছিলাম। বিস্ময়কর হলো কিয়োটো জার্নালের অনলাইন সূচিতে কিছুতেই রচনাটি আর পাওয়া যায় না (সম্ভবত ৬৪তম সংখ্যায় প্রকাশিত ছিল)। এখানে বাকি দুটোর ঠিকুজি দিচ্ছি :

মানস চৌধুরী, "তসলিমা নাসরিন প্রসঙ্গ এবং বাংলাদেশের লিবারেল কারককুল", নারী ও প্রগতি, বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ, সংখ্যা ৩, জানুয়ারি-জুন ২০০৬, ঢাকা।

http://bnps.org/wp-content/uploads/2009/07/taslimanasreen.pdf

https://archive.thedailystar.net/forum/2013/March/indipendent.htm

সার্বভৌম জীবনাচরণের অংশ হিসেবে প্রদর্শন করেছিলেন। এগুলো ছিল তাঁর একঘরে বা কোণঠাসা হয়ে পড়ার নিমিত্ত ও কারণ। তিনি সম্ভাব্য মিত্রদের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়েছিলেন ইসলামপন্থীদের দ্বারা নিগৃহীত ও নির্বাসিত হবার আগেই। কিন্তু সেই কোণঠাসাকরণের প্রক্রিয়াটা সূক্ষ্ম।

সায়দিয়া গুলরুখের সঙ্গে যৌথ একটা রচনায় [১] আমরা দেখিয়েছিলাম, কীভাবে পুরুষের যৌন সহিংসতা খোদ যৌন পরিমণ্ডল বিষয়ে গড়পরতা সমাজ-ধারণার সঙ্গে সম্পর্কিত। ভাষা ও কল্পনারাজ্যে পুরুষাধিপত্য এমনভাবে নিগড় করে রেখেছে যে, পুরুষের আটপৌরে দৈনন্দিন ভাষা, তাই ক্রিয়াকাণ্ড, অবলীলায় নারীর জন্য আক্রমণাত্মক, এবং যৌন-আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে। মোটামুটি এমন কতগুলো পর্যবেক্ষণ ও প্রতিপাদ্য সেখানে ছিল। এখানে রচনাটি মনে পড়বার কারণ কেবল প্রায় দু'দশক আগে এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করার কীর্তি তুলে ধরবার জন্য নয়, বরং কিছু পর্যবেক্ষণ এখানে আরো এগিয়ে নেবার জন্যই।

প্রথমত, পুরুষালি আচরণ সংগঠিত ও সংঘটিত হবার জন্য ভাষা ও চিন্তারাজ্যের একটা বনিয়াদ প্রস্তুত হতে থাকে। সেই বনিয়াদের ওপর পুরুষের নানাবিধ আচরণ দানা বাঁধে বস্তুত চিন্তারাজ্যের সেসবকে 'নর্মাল' বা স্বাভাবিক হিসেবে পরিগণিত করেই।

দ্বিতীয়ত, সমাজের সংস্কার বা কথিত মূল্যবোধগুলো লিঙ্গোত্তীর্ণ বা লিঙ্গনিরপেক্ষ আন্দাজ করে নেবার যে চল আছে, তার বাস্তবিক কোনো ভিত্তি নেই। এই কথাটা বাহ্যত সরল হয়ে পড়তে পারে; মনে হতে পারে এটা আবার বলার কী হলো, সকলেই তো জানি! আমার বিশদ করার জায়গাটা হচ্ছে কিছু জাতি বা গোষ্ঠী ধরে যেসব বৈশিষ্ট্যের ঘোষণাপত্র আছে, তাতে নারী-পুরুষ সমানপ্রায় অংশীদারিত্ব নিয়ে একটা লিঙ্গাত্মক পরিস্থিতি তৈরি করেন। ধরা যাক, 'বাঙালি নারী রেঁধে খাওয়াতে ভালোবাসে না' কিংবা 'আমাদের মেয়েদের মুখ ফুটে না' ধরনের ঘোষণাগুলোকে কেবল পুরুষ রচিত/সম্প্রচারিত/বিশ্বাসকৃত হিসেবে দেখা সমীচিন হবে না। বরং, বিভিন্ন নারীও এসব সংস্কারকে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁদের পক্ষে গোড়াতেই এসব লিঙ্গ সরলীকরণের সকল বচন খারিজ না করার বিরাট ঐতিহাসিক ক্ষয়ক্ষতি আছে।

তৃতীয়ত, পুরুষের আক্রমণাত্মক আচরণ কোনগুলো সেগুলো সম্বন্ধে পুরুষের সম্যক ধারণা আছে তা ধরে নেওয়ায় ভুলভাল হবার সম্ভাবনা আছে। যৌন আক্রমণকারী পুরুষদের নানাবিধ আচরণকে নিজেরা বড়োজোর আইনের লঙ্ঘন হিসেবে দেখতে পান। এর সঙ্গে নানান সামাজিক প্রবণতা যোগ করে বড়োজোর 'পাপবোধ' ও তার সাময়িক চ্যুতিও দেখতে পারতে পারেন। কিন্তু কিছুতেই লিঙ্গ-গণতন্ত্রের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার পুরুষ বেশি নয়। সেটার সঙ্গে সমাজের বৃহত্তর দার্শনিক-রাজনৈতিক বিষয়াদি জড়িত। শেষোক্ত প্রসঙ্গটি উল্লেখ করাই ঝুঁকিপূর্ণ, কারণ এই প্রস্তাবনায় মনে হতে পারে যৌন-আক্রমণের সাফাই গাইবার একটা যুক্তি সরবরাহ করা হচ্ছে। তবে লাগাতার মিডিয়া প্রচারণার পরও জন্মদান ও জন্মনিয়ন্ত্রণের বিষয়গুলো নিয়ে গড়ে সমাজে কী কী ধরনের ধারণা বিদ্যমান আছে,

[১] সায়দিয়া গুলরুখ ও মানস চৌধুরী, "যৌনতা ও নারীমুক্তি প্রসঙ্গ", সমাজ নিরীক্ষণ, সংখ্যা ৭৪, সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা, ১৯৯৯।

তার দিকে চুলচেরা তাকালেই আমার প্রস্তাবনাটিকে অত প্রতিপক্ষীয় মনে নাও হতে পারে। উদাহরণটিতে কেবল 'অবিজ্ঞানী', 'হাতুড়ে' লোকজনের চালিয়াতিই দৃষ্ট হবে না, বরং বাচ্চা পাইয়ে দিতে 'বিজ্ঞানপক্ষীয়দের' সুনির্দিষ্ট বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলোও নজরে পড়বে।

এই বিষয়গুলো এখানে পর্যবেক্ষণ হিসেবে আনবার, আমার তরফে, কারণ হলো এটা সামনে রাখা যে যৌনতার বিষয়ে গড়ে অজস্র সমাজ-দর্শন আছে, যা লিঙ্গবৈষম্য সাপেক্ষে ও ব্যতিরেকে উভয়ভাবে পাঠযোগ্য। আবার সেসব সমাজ-দর্শনের সঙ্গে অভিঘাত ছাড়া লিঙ্গবৈষম্যের রাজনীতিতে অনুপ্রবেশ দুরূহই না কেবল, নিষ্ফলও হতে পারে। আমি দুর্দান্ত কিছু একটা আবিষ্কার করে ফেলার ভার নিয়ে লিখছি না, বরং ধরে নিচ্ছি বিদ্যাজগতের ও লিঙ্গ-রাজনীতি জগতের নানাবিধ আবিষ্কার, আমার জানা ও অজানা, একত্রে অনুধাবনের চেষ্টাতেই লিখছি।

চার.

প্রসঙ্গটি যতটা যৌনতার, ততটাই নৈতিক পাহারাদারীর। এমনকি এ দুয়ের অবিমিশ্রতা আলাদা করা শক্ত। বহু বছর আগে মুনীরের পাশাপাশি খুকুর ফাঁসি চাওয়া হয়েছিল। নিহত রিমার পরিবারের লোকজনের কথা হচ্ছে না। নারী সংগঠকদেরই গুরুত্বপূর্ণ অংশ বিভিন্ন শহরে এই দাবি হাজির করেছিলেন। ঠিক কী কারণে খুকুর ফাঁসি চাওয়া হয়ে থাকতে পারে? একজন হত্যাকারীর সঙ্গে যৌনসম্পর্কের কারণে? নাকি বিবাহ-বহির্ভূত যৌনসম্পর্কের কারণে? দেশব্যাপী যখন অন্যদের পাশাপাশি নারী আন্দোলনের কর্মীরাও নেমেছিলেন, তখন বাংলাদেশের লিঙ্গভিত্তিক রাজনৈতিক আন্দোলনের একটা গুরুতর অশনিসংকেত দেখা দিয়েছে। বয়স বিচারে আমি সেই ঘটনার সময় 'চিন্তাশীল' প্রাণী নই; সমাজ-সংস্কারের প্রপাগান্ডাসেবী এক শিশু মাত্র। কিন্তু নারী আন্দোলনের কর্মীরা তা ছিলেন না। তবে একটা ঘটনাকে স্মারকমূল্য দেওয়া ছাড়া আমি বিশেষ বিশ্লেষণ-গুরুত্বও দিচ্ছি না। বরং, এমনকি সমকালেও, সমধর্মী ঘটনার সময়ে সমধর্মী প্রতিক্রিয়াগুলোকে গুরুত্ব দেবার পক্ষে আমি। সেই প্রতিক্রিয়াগুলো সাধারণ পুরুষাধিপত্যকামী মানুষজনের যেমন থাকে, নারী আন্দোলনের কর্মীদেরও থাকে।[৮] একগামী সম্পর্কের মতাদর্শিক ভার নিয়ে এইসব প্রতিক্রিয়া সচল থাকে।

একগামিতা ও বিবাহের 'পবিত্রতা'র পক্ষে অবস্থান নেবার ক্ষেত্রে একটা যুক্তি প্রায়শই লিবেরেল নারী কর্মীদের অনেকে দিয়ে থাকেন। লিখিতভাবে দেন, আলাপ-আলোচনায় আরো বেশি দেন। যুক্তিটি 'সমাজের' বৃহত্তর মানুষের আবেগ-অনুভূতির। যুক্তিটি এমন অবধারিত এবং সাধারণ দশার পরিচায়ক যে তার প্রত্যুত্তর করাও খুব কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। বিশেষত, বাংলাদেশে ঐশী শাস্ত্রীয় পক্ষে যেরকম দৃশ্যত নড়াচড়া বাড়ছে তাতে যুক্তিটার বিপক্ষে দাঁড়ানো আরো দুরূহ হয়ে পড়ে। যাঁদেরকে মোটাদাগে

[৮] গত কয়েক বছরের মধ্যবিত্ত অঙ্গনের বেশ কিছু বিষয়ের দিকেই নজর দেওয়া যেতে পারে। তবে আপাতত স্পষ্ট করে যে পাবলিক ঘটনাটির উদাহরণ দিতে চাইছি সেটা ১২/১৪ বছর আগের জয়ন্তী রেজা নিহত হবার পরের ঘটনা প্রবাহ। 'বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ'-এর তদানীন্তন নেতৃস্থানীয়গণ প্রকাশ্য মতামতেই নিহত নারীর স্বামীর সঙ্গে কথিত সংশ্লিষ্ট নারী/দের আবিষ্কার ও শাস্তিপ্রদানের আহ্বান জানিয়ে আসছিলেন। সেখানে মৃত্যুর কারিগর হিসেবে সেসব নারীর ভূমিকাকে ইঙ্গিত করার চাইতে ঢের বেশি শক্তিশালী ছিল "অনৈতিক" সম্পর্কের দিকে।

'ইসলামপন্থী' বলা হয়ে থাকে, তাঁদের তৎপরতাগুলো দৃশ্যমান। ফলে, তাঁদের তৎপরতাকে, এবং মোটের ওপর সমাজের "মূল্যবোধ"কে কারণ হিসেবে দেখানোর সুযোগ লাগাতার বর্তমান আছে। কিন্তু, আমার আশঙ্কার বিষয় এই যে, এঁদের তৎপরতাকে যৌনতা ও বিবাহবিষয়ক মধ্যবিত্ত রুচিবোধ ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে থাকতে পারে। এমনকি সম্ভবত করে আসছে। তসলিমা নাসরিনের 'নির্বাসন' প্রসঙ্গ সেই কারণে আমার জন্য ক্রমাগত গুরুতর প্রসঙ্গই হয়ে থাকে।

যৌনতার শক্তপোক্ত একগামিতার চর্চা আছে কি না সেটা অবশ্যই ভিন্ন প্রসঙ্গ; কিন্তু কাঙ্ক্ষিত ঘোষণাটি কী হবে, কোন প্রপাগান্ডাটি আশা করা হয় সেটা খুব সহজেই টের পাওয়া যায়। তাহলে মধ্যবিত্ত নারী সংগঠক ও কর্মীদের বহুগামিতার পক্ষে অবস্থান গ্রহণই কি আকাঙ্ক্ষিত হিসেবে দাবি করছি? একটা বিশেষ অবস্থানের দিকে জবরদস্তির দাবিও তো প্রকারান্তরে অগণতান্ত্রিক লিঙ্গীয় সম্পর্ক ও যৌনানুশীলন বাছাইয়ের দিকে ঠেলবে। ফলে, বিষয়টি বহুগামিতার প্রতি প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য সমর্থনের নয়। প্রসঙ্গটি হচ্ছে বহুগামিতার প্রতি ঘৃণাত্মক এবং/কিংবা বিচারমনস্ক পরিকাঠামোর। পরিকাঠামোটি কেবল সাধারণ মানুষের নয়, বরং মধ্যবিত্ত 'অগ্রদূত' চিন্তক সমাজের, এবং তার মধ্যে থাকা, ক্ষেত্রবিশেষে নারী সংগঠকদেরও।

এই বিচারমনস্ক কাঠামোর কতগুলো আক্রমণাত্মক ফলাফল আছে। আর সেটার পরিস্থিতিও গুরুতরভাবে লিঙ্গবাচক। পুরুষের জন্য একটা অবধারিত ফলাফল হচ্ছে পুরুষের ধর্ষকামিতা ও বহুগামিতাকে আকছার গুলিয়ে ফেলা। আবারো, এই ভেদহীন পর্যবসন কেবল যাঁদের সাধারণ মানুষ বলে আন্দাজ করা হয় তাঁদের মধ্যকার কিংবা তাঁদের অভিব্যক্তির জগতের মধ্যেই সীমায়িত নয়। বরং, পাণ্ডিত্যের দুনিয়ার মানুষজন, মধ্যবিত্ত চিন্তক থেকে শুরু করে নারী আন্দোলনের নানাবিধ কর্মীর মধ্যে এই ভেদহীন বিচার জারি আছে [৯]। কেবল নৈতিকতার পাহারাদারীর দৃষ্টিকোণ থেকেই বিপজ্জনক নয়, প্রবণতাটি লিঙ্গবৈষম্য, যৌন-আক্রমণ ও নিপীড়নমূলক কর্মকাণ্ডের কারকদের শনাক্ত করা ও শাস্তিবিধানের রাস্তাটিকে অস্পষ্ট বানিয়ে ফেলছে। ধর্ষকামিতার প্রসঙ্গটি অবান্তর হবার কারণে নারীদের জন্য বহুগামিতার 'অভিযোগ' বা 'বিচারবোধ'টি একইরকম নয়। বরং, এই এক্ষেত্রে পুরুষাধিপত্যমূলক সমাজের আরো মৌলিক নৈতিক আক্রমণ বা শরমপ্রদানের রাস্তা সেটি। বহুগামিতার দায় তাঁর 'বেশ্যাবৃত্তি'র শামিল, যে 'বেশ্যাবৃত্তি'র সঙ্গে সমাজের দারিদ্র্য, জবরদস্তি, পুরুষের মরিয়া হয়ে যৌনকাজ করতে ছোটা ইত্যাদি কোনোকিছুর সম্পর্ক নেই, আছে কেবল নারীর 'চরিত্রে'র।

এগুলো সব জানা ও পর্যালোচিত কথা। সাইবারস্পেসের নানাবিধ আলাপ-আলোচনায় পুনর্সংগঠিত হতে দেখা যাচ্ছেও বটে। 'মি-টু'র কালে নতুন করে সেসব যৌন-শাসন কাঠামোকে লক্ষ করা গেছে। বিষয়টি

---

[৯] বিভিন্ন জায়গায় আমি 'নারী আন্দোলনের কর্মী' বা 'নারী অধিকার কর্মী' পদমালা আলাদা করে ব্যবহার করছি, করে থাকি, এবং তাঁদেরকে 'নারীবাদী' বলি না। এই অভীধা আমার তরফে সচেতন কাজ। যাঁরা নিজেদের 'নারীবাদী' পরিচয় দিতে সচ্ছন্দ তাঁদের মধ্যকার বোঝাবুঝির দুনিয়াও অখণ্ড অটুট নয়, তা তো বলাই বাহুল্য। আর তাঁদের মধ্যেও অনেকেই যৌন-শুচিতার ধারণা বহন করেন। তথাপি, এই পৃথকীকরণের মধ্য দিয়ে আমি ওই সম্ভাবনাটা বজায় রাখি যে ব্যাপকার্থে 'নারীবাদী' মাত্রই শুচিতার ধারণার সাংস্কৃতিক-দার্শনিক পাটাতনের সঙ্গে লড়াই চালাবেন।

হলো গণতান্ত্রিক যৌনাচরণের পরিমণ্ডলকে দেখতে পারার প্রশ্ন, অন্যের গণতান্ত্রিক যৌনাচরণকে নিয়ন্ত্রণ করার প্রশ্ন। যদি নিয়ন্ত্রণ করার মতাদর্শিক এবং/বা নৈতিক গরিমা থাকে, তাহলে বৃহত্তর লিঙ্গভিত্তিক আন্দোলনের সম্ভাব্য মিত্রপক্ষ শিথিলই থেকে যাবে। সকলের বহুগামিতার সমর্থক হবার দরকার নেই নিশ্চয়ই, এই মুহূর্তে এরকম সমর্থন নিরাপদ যে নয় তাও সত্য; কিন্তু সকলেরই একগামিতার পতাকা বহন করেই কেবল মিত্র হতে হবে এই বিধি নীতিশাসনের বিধি; লিঙ্গসমতার লড়াইয়ের আগ্রহ প্রকাশ নয়।[১০]

মানস চৌধুরী অধ্যাপক, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়। manoshchowdhury@yahoo.com

[১০] এই পর্যন্ত আলাপ চালালেও একটা পক্ষ পাওয়া যাবে, নারীবাদীদের মধ্যেও সম্ভবত, যাঁরা 'অজাচার' বা 'প্রমিসকিউইটি'র প্রসঙ্গ তুলবেন। তাঁদের যুক্তি বা মনোভাব হচ্ছে 'আমরা তো অত কঠোর একগামিতার প্রবক্তা নই; তাই বলে অজাচার? পুরুষ-নারী নির্বিশেষেই অজাচারের অভিযোগ প্রায় তাকে একঘরে করবার আধুনিক একটা প্রক্রিয়া মাত্র। সাথীর সংখ্যা কত হলে তাকে অজাচার বলা যেতে পারে, তা নিয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণা থাকতে পারে; আমার জানা নেই। যদি ম্যানিপুলেশন এবং জবরদস্তির অভিযোগ থাকে, বিদ্যমান পরিস্থিতিতে কেবল পুরুষেরই জবরদস্তিকার হওয়া অনুমিত, তাহলে প্রতিপক্ষতা ঘোষণার জন্য আদৌ সাথীসংখ্যা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হবার কথা নয়।